প্রথম অধ্যায়

লোককথার সাধারণ পরিচয়
ও
শ্রেণিবিভাগ

লোককথার সাধারণ পরিচয়

আধুনিককালে সমাজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত। কারণ সমাজ-জীবন বিষয়ক নানা চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটে লোকসাহিত্যে। লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে লোকসমাজের উপর আলোকপাত করতে হয়। কেননা লোকসাহিত্য আর লোকসমাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। লোকসাহিত্যের মূল উৎস লোকসমাজ। লোকসাহিত্যের মধ্য দিয়েই চিত্রিত হয় লোকজীবন তথা লোকসমাজ। লোকসমাজের সমস্ত ধরনের ভাব-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম লোকসাহিত্য।

'লোক' শব্দটি নানা অর্থবাচক। সাধারণত 'লোক' বলতে একজন বিশেষ লোক বা ব্যক্তিকে বোঝায়। কিন্তু লোকসংস্কৃতিতে 'লোক' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লোকসংস্কৃতিতে লোক বলতে বোঝায় এমন এক বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে পরম্পরাগতভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন অতিবাহিত করে এবং একই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও সংস্কারে বিশ্বাস করে ও পালন করে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে অক্ষরজ্ঞানহীন, গ্রামীণ, কৃষি নির্ভর, সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত গোষ্ঠীই 'লোক'। আর এই 'লোক'দের দ্বারা গঠিত সমাজই লোকসমাজ বলে চিহ্নিত হয়। অথবা বলা যায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী ঐতিহ্যবাহী জীবন যাপনে অভ্যস্ত গোষ্ঠী বা জনসমাজই 'লোকসমাজ'। 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ'-এ 'লোকসমাজ'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> "একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (গ্রামে, গঞ্জে, মহকুমায়, জেলায় বা রাজ্যে, রাষ্ট্রে) বসবাসকারী সমভাষী সরল ঐতিহ্যবাহী জনসমাজকে বলা হয় লোকসমাজ।"

অন্য আরেক জায়গায় লোকসমাজের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> "শহরের দূরবর্তী গ্রামনিবাসী, সমষ্টিজীবন অনুসারী সহজে পরিবর্তন বিমুখ, সংস্কারনুবর্তী প্রায় নিরক্ষর, আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীকে লোকসমাজ বলা হয়।"

এধরণের আরও বিভিন্ন সংজ্ঞা ও লোকতাত্ত্বিকদের আলোচনা থেকে লোকসমাজ সম্পর্কে ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট হয়। লোকসমাজের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। যেমন—

১. লোকসমাজ নগর- শহর থেকে দূরবর্তী এক সংহত বা গোষ্ঠীবদ্ধ জনসমাজ, যারা সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

২. যুক্তির চেয়ে গোষ্ঠীগত আবেগের প্রাধান্য বেশি।

৩. পরম্পরাগত ও ঐতিহ্যবাহী জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলো থেকে দূরে ও পরিবর্তন বিমূখ।

৫. ব্যক্তির পরিবর্তনে গোষ্ঠীর প্রাধান্য।

৬. যাদু-মন্ত্র-তন্ত্র ও নানা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী।

৭. কৃষিই জীবিকার প্রধান মাধ্যম।

৮. লোকসমাজের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য তার অকৃত্রিমতা ও সরলতা।

৯. লোকসমাজের লোকেরা নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিত নায়।

১০. এরা সৃষ্টিশীল প্রতিভারও অধিকারী।

গ্রামসমাজ বা গ্রামীণ জীবনই লোকসমাজের ভিত্তি। তবে গ্রামীণ সমাজ আর লোকসমাজ এক নয়। একইভাবে আদিম সমাজ, লোকসমাজ এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে মাত্রাগত বা স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। এর লোকসমাজের পূর্বাবস্থা। এর পরিশীলিত তথা উন্নততর অবস্থা হচ্ছে লোকসমাজ। একটি গ্রামে এক বা একাধিক লোকগোষ্ঠী থাকা সম্ভব। লোকসমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, চিন্তা-চেতনা, প্রেম-প্রীতি, রীতি-নীতি ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যম বা বাহন তাদের নিজস্ব ঘরানার শিল্প ও সাহিত্য। তারা খেতে মাঠে কাজ করতে করতে শ্রম লাঘবের কামনায় মুখে মুখে গান রচনা করে গান গায়। ঘরে ফসল তোলার আনন্দে পশু-পাখিদের অনুকরণে নাচ করে। অবসরকালে ছড়া বাঁধে। মনের খেয়ালে নানাকথার মালা গাঁথে। ভয়ে ভক্তিতে নানা দেব-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে। বলাবহুল্য তাদের পূজা-অর্চনা হয়। তাদের জীবন নানা নৃত্য-গীতে যেমন ভরপুর তেমনি সাহিত্যেরও হদিশ মেলে। এই 'লোক'দের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য। যা 'মৌখিক সাহিত্য', 'গ্রাম্যসাহিত্য' ইত্যাদি নানা নামেও পরিচিত।

লোকসাহিত্য লোকসাধারণের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। লোকসাহিত্যের মূল উৎস লোকমন ও লোকসমাজ বা লোকজীবন। লোকসাহিত্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> "যে সাহিত্য লোকেদের জন্য, লোকেদের দ্বারা, লোকেদের নিয়ে সৃষ্ট, তাই লোকসাহিত্য।"

অর্থাৎ লোকসমাজে লোকেদের দ্বারা লোকেদের জন্য সৃষ্টি হওয়া সাহিত্যই লোকসাহিত্য। ভারতের গণতন্ত্রের সংজ্ঞার সাথে এর মিল লক্ষ করা যায়। এছাড়াও লোকসাহিত্যের আরেকটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> "বিশেষ প্রয়োজনে ও সৃষ্টির আনন্দে গোষ্ঠীসমাজ প্রাথমিক অবস্থায় যে মৌখিক সাহিত্যের জন্ম দেয়, তাই ব্যাপক অর্থে লোকসাহিত্য বলে সুপরিচিত।"

অর্থাৎ লোকসাহিত্য গোষ্ঠীসমাজ তথা লোকজীবন ও লোকসমাজের বাঙ্ময় রূপ। লোকসমাজভূক্ত সহজ সরল মনের অধিকারী নিরক্ষর লোকেরাই লোকসাহিত্যের স্রষ্টা। তারা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ও সৃষ্টির আনন্দে নানা গীত, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, কথা ইত্যাদি মুখে মুখে রচনা করে। মুখে মুখেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা বহমান। তাই লোকসাহিত্যকে বল হয় মৌখিক সাহিত্য। লোকসাহিত্য কোনো নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির সম্পদ নয়। কেননা লোকসাহিত্যের স্রষ্টা গোটা সমাজ। প্রথমাবস্থায় কোনো একজন ব্যক্তির মুখেই তা সৃষ্টি লাভ করে। তবে সৃষ্টির পর তা হয়ে যায় সর্বজনীন। যেহেতু তা মুখে মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখে মখে প্রচারিত হয় তাই একমুখ বা এক প্রজন্ম থেকে অন্য মুখ বা অন্য প্রজন্মে গিয়ে তা আবারও নতুন রূপে তৈরি হয় কিংবা নতুন রূপ লাভ করে। ফলে তখন গোটা সমাজই হয়ে য়ায় তার স্রষ্টা। মুখে মুখে প্রচারিত হবার পর লোকসাহিত্য অনেক সময় লিখিত রূপ লাভ করে। তবে সব মৌখিক সাহিত্যই যে লিখিত রূপ লাভ করে তা নয়। লোকসাহিত্য যদিও গ্রামীণ নিরক্ষর লোকেদের দ্বারা সৃষ্ট তথাপি তার সৃষ্টিধর্মিতাকে অস্বীকার করা যায় না। লোকসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার সর্বজনীনতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা। লোকসাহিত্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যও অপরিসীম। কেননা পৃথিবীর সব দেশের পরিশীলিত তথা লিখিত সাহিত্যের পশ্চাতে রয়েছে লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

> "পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও লিখিত সাহিত্যের পশ্চাতে আছে এক সুদূরপ্রসারী লোকঐতিহ্য। মানুষ যখন লিখতে শিখে নাই বা আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার উদ্ভাবন হয় নাই তখনও তারা নিজেদের চিত্ত বিনোদনের জন্য গল্প-কথা, সংগীত, হাসি-তামাসা বা সাধারণ বুদ্ধি চর্চা করত। গুহাচারী মানুষ তাদের গুহার গাত্রে সাধারণ প্রস্তর দিয়ে ছবি আঁাকারও চেষ্টা করেছে। আজ থেকে শত-সহস্র শতাব্দী পূর্বে প্রকৃতি এবং পৃথিবীই ছিল আদিম সহজ সরল মানুষের শিক্ষাক্ষেত্র।"

অর্থাৎ দেখা যায় যে যন্ত্র সভ্যতার সৃষ্টির পূর্বেই সহজ সরল মানুষ সন্ধান করেছে মনের ভাব প্রকাশের নানা মাধ্যম। যার অন্যতম হচ্ছে লোকসাহিত্য। তাই লোকসাহিত্যকে মানব ইতিহাসের দলিল বলেও উল্লেখ করা যায়।

লোকসাহিত্যকে লোকজীবন থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। লোকসাহিত্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থান, পুরাতত্ত্ব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি। ফলস্বরূপ সমগ্র বিশ্বেই বর্তমানে লোকসাহিত্যের চর্চা ও গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

লোকসাহিত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- লোককথা, লোকসংগীত, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, গীতিকা, লোকনাট্য ইত্যাদি। এদের মধ্যে লোকসাহিত্যের একমাত্র গদ্যরূপ লোককথা। বাকিগুলো ছন্দোবদ্ধ ও গীতিময়। প্রধানত লোককথা হলো মুখে মুখে প্রচলিত গল্প। গল্প বলা এবং গল্প শোনা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আদিমকাল থেকেই বাস্তব-অবাস্তবের দোলায় নানা ধরনের গল্প কাহিনির মালা গেঁথে মানুষ আনন্দ লাভ করেছে। জানা-অজানা নানা ধরনের অসংখ্য কল্প কাহিনির স্রোতে মানুষের মন অবাধ গতিলাভ করেছে। সকল শ্রেণির সব বয়সের মানুষের কাছেই এই গল্প বা কাহিনি ছিল আনন্দ দানের রসদ। কেননা এই লোকগল্প বা কাহিনির মধ্যে এক বিশেষ জীবনীশক্তি রয়েছে।

বাংলা ভাষায় 'লোককথা' শব্দটির প্রচলন শুরু হয়েছে আধুনিককালে। লোককথা শব্দটি ইংরেজি 'ফোকটেল'-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইংরেজিতে 'ফোকটেল' বলতে বোঝায় গদ্যের মাধ্যমে বর্ণিত কাহিনি। ভারতীয় আর্য ভাষায় 'কথা' অর্থে যে কোন কাহিনি বা গল্পকে বোঝানো হতো। ভারতীয় জনসমাজে প্রচলিত সবরকমের বিবরণীকে 'কথা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন পঞ্চতন্ত্রের কথা, জাতকের কথা, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। লোককথার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ বলেছেন—

> 'পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বা লোককাহিনি ( ) বলা হয়। ছোট হোক বড় হোক গল্পটি হবে পূর্ণাঙ্গ। একক ও সরলরৈখিক গল্প যেমন আছে, তেমনি বিভিন্ন শাখা সম্বলিত জটিল গল্পও আছে। বলা বাহুল্য প্রথম শ্রেণির গল্প আকারে ছোট ও দ্বিতীয় শ্রেণির গল্প বড় হয়। লোককথায় এক বা একাধিক মোটিফ থাকে।'

লোককথার সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে-

> 'বর্তমানে লোককথা বলতে সেইসব কাহিনিকে বোঝানো হয় যা গদ্যে বিধৃত। কিন্তু লিখিত বা অলিখিত ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে হস্তান্তরিত হয়ে এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে পৌঁছেছে। অর্থাৎ লোককথা বলতে বোঝায় পুরুষ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত গল্প বা কাহিনি যা এক বিশেষ ভঙ্গিমায় বিশেষ সুরে বিধৃত হয় এবং যা সাধারণ মৌখিক গদ্যের ভাষায় রচিত।'

প্রসঙ্গত লোককথার আরও একটি সংজ্ঞা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের অ-সভ্য সমাজে উদ্ভূত আদিম বিশ্বাসের কাহিনি থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত যে ঐতিহ্যিক প্রবহমান কাহিনির স্রোত- কথাসরিৎসাগর, আরব্য রজনী এবং সর্ববিধ পুরাকাহিনি-রূপকথা-উপকথা-পশুকথা প্রভৃতিকে বহন করে চলেছে তাকেই লোককথা নামে চিহ্নিত করা হয়।'

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে লোককথা সম্পর্কে আমাদের ধারণা মোটমুটি স্পষ্ট হয়। লোককথার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে যেমন-

১. লোককথা লোকসাহিত্যের একমাত্র শাখা যা গদ্যে বর্ণিত।

২. লোককথা মৌখিক পরম্পরায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবহমান।

৩. লোককথা ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও আদিমকাল থেকেই এর যাত্রা শুরু হয়েছিল বলে অনুমান।

৪. লোককথার উৎস লোকমন ও লোকজীবন।

৫. লোককথার প্রধান বৈশিষ্ঠ্য তার অকৃত্রিমতা ও সরলতা।

৬. লোককথা নৈর্ব্যক্তিক।

৭. লোককথা যেমন একক এবং সরলরৈখিক তেমনি বিভিন্ন শাখা সম্বলিত জটিলও।

৮. লোককথায় পশু পাখি ও বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু মানুষের মতো কথা বলে এবং আচরণ করে।

৯. লোককথা এক বিশেষ ভঙ্গিমায় বিশেষ সুরে বর্ণিত হয়।

১০. লোককথা স্থির নয়, নদীর মতো বা মেঘের মতো প্রবহমান।

বহুবিচিত্র জীবন ও তার গতিপ্রকৃতি নিয়েই লোককথার ঐশ্বর্য। লোককথাকে আবার বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

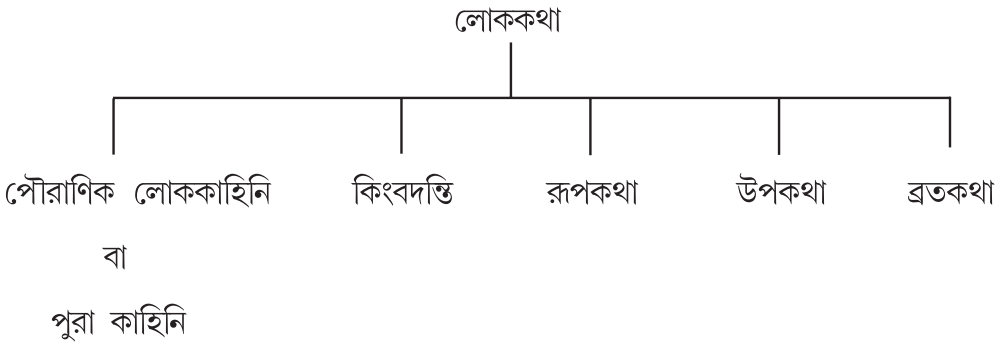

পৌরাণিক লোককাহিনি বা পুরাকথা :

পৌরাণিক লোককথা বা পুরাকাহিনি হচ্ছে এমন এক ধরনের কাহিনি যা বৃক্ষ-লতা-পাতা, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা প্রভৃতি বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডের অতিলৌকিক বিষয়, দেব-দেবী, মানুষ-পশু-পাখি ইত্যাদির জন্ম সংক্রান্ত কাহিনি বা উদ্ভবের কাহিনি রূপে পরিবেশিত হয়। অর্থাৎ মানুষের আদিমতা, আচার-আচরণ, ভয়-ভীতি, বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যাকুলতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, জৈবিক আবেদন, মানসিক উত্তেজনা, উদ্বেল হৃদয়বৃত্তির নানাদিক যেসব কাহিনিতে প্রতিফলিত হয় তাই পৌরাণিক লোককাহিনি বা পুরাকথা নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ পুরাকালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার আকারে পৌরাণিক লোককথা বা পুরাকাহিনিতে উপস্থাপন করা হয়। মানুষের সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার উদ্দেশ্যেই জন্ম হয়েছে এই সমস্ত কাহিনির। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেখা অদেখা বস্তু সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল জন্মেছিল। আর এই কৌতূহল নিবারণের জন্য তারা নানা রকমের কল্পনা মিশ্রিত ব্যাখ্যা দিয়েছে। মানুষের আবির্ভাব, দেব-দেবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি, জন্ম-মৃত্যু রহস্য, মানুষের মনে নানা রকম প্রশ্নের উদ্রেক করেছিল। এবং তার উত্তরও তারা নানা ধরনের কাহিনিকে আশ্রয় করে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই কাহিনি গুলোই লোকসমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে যুগযুগান্তর ধরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—

> ‘লোককথার এই বিভাগটির মধ্যে মানব মনের রহস্যঘন রূপটির সন্ধান সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। যে জনগোষ্ঠী যত প্রাচীন ও পুরানো মূল্যবোধ অচল রয়েছে তাদের মধ্যে আদিম পুরাকাহিনি বা লোকপুরাণের সন্ধান তত বেশি পাওয়া যায়।’

পৌরাণিক লোককথা বা পুরাকথার উৎস হচ্ছে লোকমন ও লোকসমাজ। পুরাকাহিনিকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘মিথ’। আদিম মানুষের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ‘মিথ’কে স্যার জি. এল. গোমে বলেছেন ‘দ্য সায়েন্স অব এ প্রিসান্টেফিক এজ’। বিজ্ঞানে যেমন ‘কে?’, ‘কি?’ ‘কিভাবে?’ ‘কখন?’ ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয় ঠিক তেমনি পৌরাণিক লোককথা গুলোতেও মানব মনের রহস্যের সমাধানের যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করা হয়। লোক গবেষকের মতে—

> 'সৃষ্টির দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিবার কৌতুহল লইয়া অপরিণত বুদ্ধি মানব একদিন যে সকল অলৌকিক কাহিনি রচনা করিয়াছিলেন, ইংরেজিতে তাহাদিগকে 'মিথ' বলে বাংলায় তাহা লৌকিক পুরাণ অথবা পুরাকাহিনি বলিয়া অনুবাদ করা যায়।'

ভয়, বিস্ময়, আনন্দ মিশ্রিত অলৌকিক কল্পকাহিনি হচ্ছে পৌরাণিক লোককথা। কৌতুহল বোধ থেকেই মানুষের জ্ঞান লাভের সূচনা। সেই অর্থে পৌরাণিক লোককাহিনিগুলোকে বলা যায় মানবজাতির জিজ্ঞাসার প্রথম সোপান।

কিংবদন্তি ( )

যে সমস্ত লোককথায় কোন বীরপুরুষ, কোনো বিখ্যাত কবি, সমাজসংস্কারক, অত্যাচারী সম্রাট, ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং এই জাতীয় চরিত্রের এক বা একাধিক কাহিনি বর্ণিত হয় সে গুলোই হচ্ছে কিংবদন্তি। এছাড়াও কোনো আঞ্চলিক বৃক্ষ, পাহাড়, পর্বত, বিল-ঝিল, নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, মন্দির-থান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা কাহিনিও কিংবদন্তি হতে পারে। কিংবদন্তি খাঁটি ইতিহাস নয়। কেননা ইতিহাস সত্য ঘটনা নির্ভর। আর কিংবদন্তি হচ্ছে আংশিক সত্য ঘটনা আর কিছু কল্পনার মিশ্রণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—

> "বস্তুত লোকযানের পরিমণ্ডলে লিজেণ্ড- একধরনের ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহাসিক লোককথা। এই সব কাহিনি ইতিহাসের ঘটনা থেকে পৃথক এবং কোনো ঐতিহাসিকই লিজেণ্ডকে ইতিহাসের মর্যাদা দেবার কথা ভাবতেও পারেন না। তার কারণ এই যে ইতিহাস কোনোরূপ অতিরঞ্জনের পক্ষপাতি নয় এবং লিজেণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করে অতিরঞ্জনের উপর। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করে এবং ওইসব কাহিনির সত্যতা সম্পর্কে তারা নিঃসন্দেহ।"[১২]

কিংবদন্তি শব্দটিকে ইংরেজি 'লিজেণ্ড' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিংবদন্তি ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, তরুণ-বৃদ্ধ ইত্যাদি সমাজের সব স্তরের মানুষের দ্বারা গড়ে উঠতে পারে। কিংবদন্তির কাহিনিগুলোকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার খেয়াল খুশিমতো রাঙিয়ে পরিবেশন করা হয়। কাহিনিগুলো লোকসমাজের মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

কিংবদন্তির কাহিনিগুলো তার নির্দিষ্ট অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। এবং যুগ যুগ ধরে লোকমুখে বহমান থাকে। লোকমুখে দীর্ঘকাল ধরে প্রসারিত হতে থাকার ফলে তা অতিরঞ্জিতও হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় তার মূল ঘটনা বা সত্য ঘটনাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। কিংবদন্তির সঙ্গে আবার মিশে থাকে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার।

উপকথা বা নীতিকথা মূলক লোককথা

লোককথার আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ উপকথা বা নীতিকথা মূলক লোককথা। উপকথার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> "পশু-পাখির চরিত্র অবলম্বন করে যে সব কাহিনি রচিত হয় তাকে - সাধারণতঃ বাংলায় উপকথা বলে। কাহিনীগুলির দুটি উদ্দেশ্য- প্রথমতঃ কৌতুকরস সৃষ্টি ও দ্বিতীয়তঃ নীতি প্রচার। কাহিনীতে মানুষের চরিত্রগুলি পশু-পাখির ছদ্মবেশে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।"

অর্থাৎ, পশু-পাখি ও বিভিন্ন জীব-জন্তুকে কেন্দ্র করেই উপকথার জন্ম। তবে মনুষ্য চরিত্রও এর মধ্যে থাকে। শিয়াল, সিংহ, বাঘ, বানর, কুমির, ছাগল, খরগোশ, হরিণ, বিড়াল, কাক, চড়ুই, টুনটুনি, কৈ মাছ, কাঁকড়া, তোতা, বক, শকুন ইত্যাদি এ ধরনের লোককথার উল্লেখযোগ্য চরিত্র। উপকথা বা নীতি কথার মূল উদ্দেশ্য কাহিনি শেষে কোন উপদেশ দেওয়া। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে থাকে উপকথার মধ্যে।

উপকথার বা নীতিবচন মূলক লোককথার পশু-পাখি ও জীব-জন্তু মানুষের মতোই কথা বলে এবং আচরণ করে। আসলে এরা মানুষেরই রূপক। অন্যান্য লোককথার মতো উপকথার রচয়িতারাও অতি সাধারণ মানুষ। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাই যেন অতি সহজ সরল ভাষায় কাহিনিমধ্যে ফুটে উঠেছে। উপকথার প্রধান বৈশিষ্ট্য সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের জয়।

রূপকথা

লোককথার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিভাগ রূপকথা। লোককথার সব শাখার মধ্যে এই শাখাটি সবচেয়ে জটিল ও দীর্ঘ স্বভাবের। রূপকথা সন্ধান দেয় এক স্বপ্নমধুর জগতের। এরমধ্যে থাকে বিস্ময় আর চমৎকারিত্বের প্রচুর উপাদান। রাজপুত্র, রাজকন্যা, পঙ্খীরাজ ঘোড়া, ঘুমন্তপুরী, তেপান্তরের মাঠ, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, রাক্ষস-খোক্ষস, দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের চরিত্র রূপকথায় রোমান্সের সৃষ্টি করে। রূপকথার নায়ক নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অসাধ্য সাধন করে। রাক্ষস ও দৈত্য-দানবের হাত থেকে রাজকুমারী বা নায়িকাকে উদ্ধার করে। সোনার কাঠি, রূপার কাঠি ছুঁইয়ে মৃতকে পুনর্জীবিত করে। প্রথমে রাজা-রানীর কোনো সন্তান থাকে না। কিন্তু শেষে কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর আশির্বাদে কোনো ফল খেয়ে বা অন্যান্য নানা অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভ করে। আবার কখনো মানুষের গর্ভে জন্ম হয় পশুর। অর্থাৎ রূপকথায় থাকে এক অদ্ভূত অবাস্তব ও অলৌকিক জগৎ। তবে আপাতদৃষ্টিতে রূপকথাগুলি অলৌকিক ও অবাস্তব ধরনের হলেও মানবজীবন থেকে একেবারে সম্পর্কহীন নয়। প্রসঙ্গত সমালোচকের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> "রাজা-রানী-রাজপুত্র- রাজকন্যা-রাক্ষস-দৈত্য-ডাইনি-যাদু-মন্ত্র-অলৌকিকতা ইত্যাদির বহিঃসৌধের অন্তরালে সাধারণ মানুষের জীবনের প্রত্যাশা ও নৈরাশ্য, আকাঙ্ক্ষা ও চরিতার্থ এবং কল্পনা ও বাস্তবের পরিবেষ্টনীর উপাদান এদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।"

রূপকথা সবসময়ই মিলনাত্মক হয়ে থাকে। নায়ক হাজার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তার কাঙ্খিত মানুষ বা বস্তু লাভ করতে সক্ষম হয়। আবার রূপকথায় দেখা যায় দুষ্ট রাক্ষস-ডাইনি মানুষের মাংস আহার করে কিন্তু বন্দী রাজকন্যাকে তারা খায় না। বিমাতাকে তার সপত্নী সন্তানদের উপর দুর্বিষহ অত্যাচার করতেও দেখা যায়। রূপকথাকে ইচ্ছাপূরণের পরোক্ষ মাধ্যমও বলা যায়। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মানুষ একটু আনন্দ চায়, একটু সুখ চায়। তাই মানুষ আশ্রয় নিয়েছে কল্পনার। সেখানে দূর্বল, চরম দুর্ভাগ্যে পতিত নায়ক বা নায়িকা বা অন্য কোনো চরিত্র শেষপর্যন্ত জয়ী হয়। অত্যাচারিত রাজপুত্রের

সাহায্যে এগিয়ে আসে কোনো পরী বা অলৌকিক শক্তি। সন্তানহীন রাজাও কোনো অলৌকিক শক্তি বা কারো সাহায্যে সন্তান না থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে। রানীর বন্ধাত্ব ঘোচে। ভাগ্য বা নিয়তির ভূমিকা রূপকথায় ব্যপক পরিমাণে রয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপকথার ব্যাখ্যায় বলেছেন—

> "রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে। সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই শেষও নেই যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুরের সে রাজ্য ছেড়ে চলে যায়,...মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন করে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। .....ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ-সে রাজপুত্তুর।"

বরাক উপত্যকায় প্রচলিত একটি রূপকথা হচ্ছে— 'সোনার গাছ রূপার পাত, তার উপর হীরামন তোতায় নৃত্য করে'। এই রূপকথাটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। কারণ এই রূপকথাটিতে মোট সতেরোটি মোটিফ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য এখন পর্যন্ত সর্বাধিক মোটিফের সন্ধান পাওয়া গেছে 'সাতভাই এক বোন' লোককথাটিতে, মোট একুশটি। সেই হিসেবে দেখা যায় যে 'সোনার গাছ রূপার পাত, তার উপর হীরামন তোতায় নৃত্য করে' রূপকথাটি রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

ব্রতকথা

লোককথার একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাখা ব্রতকথা। বাংলার লোকজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 'ব্রত'। সুখ সমৃদ্ধি ও সর্বজনের কল্যাণের কামনায় বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পালিত সংযম ও আচার অনুষ্ঠান-ই ব্রত। ব্রতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> "সাধারণত কোন কিছু কামনা করে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে কোন বিশেষ আচার বা অনুষ্ঠান করা কিংবা পার্থিব কল্যাণ কামনায় 'দশেমিলে' যে সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকেই ব্রত বলা হয়"।

ব্রতের সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পকলা যুক্ত রয়েছে। যেমন- আলপনা, নৃত্য-গীত, ছড়া ইত্যাদি। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ব্রতের মাহাত্ম্য সূচক কথা বা কাহিনি। বিশেষ বিশেষ ব্রতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ কাহিনি। যার মূল বিষয় সেই বিশেষ দেব বা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার। ব্রতের সঙ্গে যে সব কথা বা কাহিনি আবৃত্তি করা হয় বা শোনানো হয় তাকেই বলা হয় ব্রতকথা। এই ব্রতকথা বাংলার লোকসাহিত্যের তথা মৌখিক সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—

> "ব্রত অনুষ্ঠানের কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং সামাজিক মূল্য অপরিসীম। ব্রতের কাহিনীতে গ্রাম্য মেয়েরা সহজ ভাষায় নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করে থাকে। তাদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি কাহিনীগুলিতে প্রকাশিত হয়।"

ব্রতকথায় লোকসমাজ তথা লোকমানসের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ, অত্যাচার-নিপীড়ণ-বঞ্চনা প্রভৃতি নিয়েই মানুষের জীবন। এই জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের আশায়, স্বামী সন্তানের ও পরিবারের অন্যান্য সকলের মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন ব্রতের মাধ্যমে লৌকিক দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা হয়। এই ব্রতে পরিবারের মেয়েদের ভূমিকাই প্রধান। তবে পুরুষেরাও যে ব্রত-পার্বনে অংশ গ্রহণ করে না এমন নয়। এমন কিছু ব্রতের প্রচলন রয়েছে যা শুধু পুরুষেরাই করে। কিন্তু তথাপিও বলা যায় যে ব্রত উৎসব প্রধানত মেয়েদেরই। যার ফলে মেয়েদের কথাই বেশি করে ফুটে উঠতে দেখা যায় ব্রতকথায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

> "ব্রতের ছড়া যেন নারীর মনের মুকুর। ব্রতের ছড়ার দর্পণে নারী নিজের ভাবী সুখী জীবনকে দেখতে চায়। ব্রতের ছড়াগুলির মধ্যে নারীমনের আশা আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা প্রতিধ্বনি শোনা যায়।"

কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা অন্তেবাসী। মেয়েদের রয়েছে এক নিজস্ব জগৎ। নানা অন্যায় আচরণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করা সবসময় সম্ভব হয় না। ফলে নানা কৌশলে পরোক্ষভাবে মেয়েরা তাদের মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করে। এরকমই একটা মাধ্যম এই ব্রত। তাইতো দেখা যায় ব্রতে প্রয়োজন হয় না ব্রাহ্মণের। ব্রতের

উপকরণ অতি সামান্য সাধারণ সহজলভ্য সামগ্রী, যেমন- আমপাতা, দূর্বা, সিঁদুর, মাটির ঘট, ফুল আর কলা পাতা হলেই ব্রতের আয়োজন সম্পন্ন হয়। নিজে পাঁচালি পাঠ করে বা ব্রতকথা শুনালেই ব্রত সম্পন্ন হয়।

বরাক উপত্যকায় প্রচুর সংখ্যক লৌকিক ব্রতের প্রচলন রয়েছে। এর সঙ্গে প্রচুর ব্রতকথার প্রচলন রয়েছে। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত ব্রতগুলির মধ্যে রয়েছে- রূপসী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, মাঘ ব্রত, সূর্য ব্রত, ঝটপট ঠাকুরের ব্রত, সুমতি ব্রত, জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, কর্মপুরুষ ঠাকুরের ব্রত, উদয়মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, বিপদনাশিনীর ব্রত, সংকটত্রাণী ব্রত, কল্কিনারায়ণ ব্রত, বাবাহরের ব্রত, সুপারিশ ঠাকুরের ব্রত, আট আনাজ ব্রত, ভুলাভুলি ব্রত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর বেশিরভাগ ব্রতের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে কথা অর্থাৎ ব্রতকথা। আর এই ব্রতকথাগুলি বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি আর লোকসাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

ব্রতকথার আঙ্গিক বা কাঠামো প্রায় একইরকম। ব্রতকথার কাহিনিতে দুইধরনের দেবতা লক্ষ করা যায়। একধরনের দেব-দেবী রয়েছেন যারা অতি শান্ত প্রকৃতির। আর অন্যদিকে আরেক ধরনের দেব-দেবী রয়েছেন যারা খুবই রাগী। সামান্যতম অবহেলাও তারা সহ্য করতে পারেন না। সামান্যতম ভুল-ত্রুটিতেই তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ভক্তকে শাস্তি দেন। আবার ভক্তের ভুল স্বীকার এবং অনুশোচনা হলে তাকে ক্ষমাও করে দেন। রূপকথার মত ব্রতকথায়ও ভাগ্য-নিয়তি-ললাট ইত্যাদির প্রসঙ্গ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ব্রতকথাগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দরিদ্র সাধারণ মানুষ যাদের সংসার অভাব-অনটন পূর্ণ। আর সেই অসহায় জীবন থেকে তারা মুক্তি লাভ করতে প্রয়াসী হয় কোন না কোন না দেব-দেবীর কৃপায়। অর্থাৎ তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দৈবের উপর নির্ভর করতে হয়। বিপরীতে সেই দেব-দেবীর পূজার প্রচারও হয়। ফলে দেখা যায় যে গ্রাম বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠে ব্রতকথায়। লক্ষণীয় বিষয় বরাক উপত্যকায় প্রচলিত ব্রতকথাগুলিতে এই উপত্যকার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এবার আমরা লোককথার এই বিশেষত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে বরাক উপত্যকার লোককথা সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করব।

<u>তথ্যসূত্র</u>

১. চৌধুরী, ড° দুলাল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ৪।

২. নায়েক, জীবেশ : লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও লোকসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০ পৃষ্ঠা- ৯৬।

৩. চক্রবর্তী, ড° বরুণকুমার (সম্পাদিত) : বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৫৩১।

৪. চৌধুরী, ড° দুলাল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ৪০।

৫. সিদ্দিকী, আসরাফ : লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮,পৃঃ৩১

৬. চক্রবর্তী, ড° বরুণকুমার (সম্পাদিত) : বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৪৯৪।

৭. প্রধান, ড° শ্যামসুন্দর : কিংবদন্তী উৎস নির্ণয় ও বিশ্লেষণ, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪২।

৮. করণ, ড° সুধীরকুমার : বিশ্বলোককথা সমীক্ষা, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩০।

৯. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি : বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ১০৪।

১০. তদেব, পৃ ঃ ১০৮।

১১. করণ, ড° সুধীরকুমার : বিশ্বলোককথা সমীক্ষা, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ১০০।

১২. তদেব, পৃ ঃ ১৬৮।

১৩. চক্রবর্তী, ড° বরুণকুমার (সম্পাদিত) : বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৫৬।

১৪. চৌধুরী, ড° দুলাল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ৫১।

১৫. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি : বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ৯৪।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, সৌগত : লোককথার বর্ণমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলাকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৭৯।

১৭. বসাক, ড. শীলা : বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ০২।

১৮. চক্রবর্তী, ড° বরুণকুমার (সম্পাদিত) : বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৩৯১।

১৯. তদেব, পৃ ঃ ৩৯।